মিলনসাগর
www.milansagar.com

সংসদের প্রাণশক্তি

অবনী লাহিড়ী

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের নিজস্ব ভবনটির শুভ উদ্‌বোধন হবে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী। বহুলোকের সদিচ্ছা, পরিশ্রম এবং ত্যাগ এই ইমারতটির ইট কাঠের সাথে জড়িত আছে। এ গৌরবের দিনটি সবাইয়ের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৫৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর একটি ছোট্ট চারাগাছ লাগানো হয়েছিলো করোলবাগের ১৪এ ব্লকের একটি গ্যারেজে। কেউ জানতো না এই গাছের শিকড় গ্যারেজের শানবাঁধানো চত্বরে প্রাণরস সংগ্রহ করতে পারবে কিনা। শুধু প্রবাসী মনের সহজাত সামাজিকতার মূলধন নিয়ে অনেক সংগঠনই রাজধানীর বালুময় অনুর্ব্বরতায় শুকিয়ে গিয়েছে। করোলবাগের বাঙালী সমাজ রাজধানীর আর পাঁচটা অঞ্চল থেকে কিছু ভিন্ন ধাতুতে তৈরী নয়। বাঙালী মনের ভাবালুতা আর সমাজ মানসিকতার সাথে এখানেও জড়িয়ে ছিল আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। মাঝে মাঝে কালো মেঘের ছায়া পড়েছে আমাদের অগ্রগতির পথে। তবু সংসদ এগিয়ে চলেছে। আমাদের এই পথ পরিক্রমার গৌরবের দিনগুলিকে আজ মনে পড়ছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার সাথে যাঁরা জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের কাছে একথা অজানা নয় যে এই সংস্থাগুলো কেমন করে সেদিনের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো সংগঠিত সমাজসেবার কাজে। অন্যায় আর অবিচার যে সমাজের সর্বস্তরে বাসা বেঁধেছে। সমাজসেবার কাজে নেমে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— কেন এতো লোক নিরক্ষর, কেন এই ব্যাপক দারিদ্র, কেন এই বিত্তহীনদের বিনা চিকিৎসায় মরা। কোন নিষ্ঠাবান সমাজসেবক ধর্ম্ম অথবা আধ্যাত্মিকতার নামে এই রূঢ় জিজ্ঞাসাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না। এই সমাজ চেতনার উৎস মুখ যখন রুদ্ধ হয়, তখন আসে সংকট— যেমন ব্যক্তির জীবনে, তেমনি সংস্থার জীবনেও।

রাজধানীতে সমস্যার অন্ত নেই। মধ্যবিত্ত জীবন তার দাপটে প্রায় দিশেহারা। এখনকার বালুময় মাটিতে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবু সংসদ এগিয়ে চলেছে।

কি করে এ সম্ভব হোল?

সংসদের জন্মলগ্নে এর প্রাণশক্তি আহরিত হয়েছিলো এমন কয়েকজনের সান্নিধ্যে যারা একটা আদর্শের ছোঁয়াচ এই সংগঠনকে দিতে পেরেছিলেন, তাদের জীবন দর্শন আমাদের যাত্রাপথ আলোকিত করেছিলো।

এই স্বল্প পরিসরে তাদের সবাইকে স্মরণ করার হয়তো সুযোগ নেই। তবু দুজনের কথা আমার মতো হয়তো অনেকেরই স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

প্রথম নামটি— বটুকদা। এই রকম একটি গভীর সংবেদনশীল মন প্রথম দিন থেকেই সংসদের সাথে একাত্ম হোয়ে গেলেন।

অনেকেই হয়তো জানেন না বটুকদা আর বিনয় এমন দু'জন মানুষ যাদের নাম সংগ্রামী গণ-সংস্কৃতির ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। '৪০-এর দশকে বাংলাদেশ যখন দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর সংঘাতে বিধ্বস্ত, যখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার হাত ধরে এলো বাংলা মাকে দু'টুকরো করে দেবার চক্রান্ত, পদ্মা আর মেঘনার উদ্দাম প্রাণস্রোত যেদিন আমরা হারালাম, সেদিন যাদের কণ্ঠ ও লেখনী শানিত তলোয়ারের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিলো প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের গানেও, তারাই তো আমাদের সংসদের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রথম সারিতে ছিলেন। এইতো সংসদের প্রাণশক্তির প্রধান উৎস। '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মৃতদেহ যখন রাস্তায়, তখনকার কথা বটুকদার নিজের ভাষায়—

"একদিন দেখলাম মা মরে পড়ে আছে। তার স্তন ধরে অবোধ ক্ষুধিত শিশু টানাটানি করছে আর হেচকি তুলে কাঁদছে। প্রচণ্ড অভিমান আমার গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম— না— না— না।

"এই হোলো শুরু। মনে নেই কার বাড়ীতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছিলাম, কালি কাগজ বার করে কলমে লিখেছিলাম। সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার উৎস মুখ থেকে ঝরণার মতো বেরিয়ে এল— না, না, না, মানব না, মানব না।

কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো প্রাণপণে
ভয়ের রাজ্যে থাকবো না।"

সেদিন যাদের উদাত্ত কণ্ঠ সঙ্গীতকে গণসংগ্রামের হাতিয়ার করেছিল, বিনয় রায় তাদের একটি অগ্রণী নাম।

'কাস্তেটারে দিও জোরে শান/কৃষাণ ভাইরে'—

বিনয়ের এই গান হাজার হাজার কঙ্কাল আর খেটে খাওয়া মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়েছিল।

এরাই তো জুগিয়েছিলো সংসদের প্রাণশক্তি। তাই নানা প্রতিকূলতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থের বাধা সংসদের অগ্রগতি রুদ্ধ কোরতে পারেনি।

আরো কয়েকটি কথা আজ মনে পড়ছে। মনে পড়ছে রাজধানীর বাঙালী সমাজের শক্তি আর দুর্বলতার কথা।

১৯৬৬ সালে আমাদের গেস্টহাউসের জন্ম বৃত্তান্ত। আজ দিল্লীতে অন্ততঃ দশটা গেস্ট হাউস বিভিন্ন বাঙালী সংস্থাদ্বারা পরিচালিত। সেদিন কিন্তু একটি ধর্ম্ম সংস্থার নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম্মশালা ছাড়া আর কোন অস্থায়ী বাসস্থান ছিল না। আমাদের সংসদের কার্যকরী সমিতিতেও নিজস্ব গেস্টহাউস চালানো সম্বন্ধে মতৈক্য ছিল না। প্রাথমিক খরচের ১৫০০০ টাকা কোথা থেকে আসবে? 'কে পরিচালনা করবে?' 'লোকসান হলে সে

এই লেখাটি, নেতাজী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "কল্লোলবাসী বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নবেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

এই লেখাটি, কোরাসী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

কার?'— এরকম অনেক প্রশ্ন। টাকা ধার করা হলো সংসদের শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে পাঁচ কিস্তিতে শোধ দেবার অঙ্গিকারে। বাড়ীর মালিক সংসদের নামে বাড়ী ভাড়া দিতে অস্বীকার কোরলো —কি জানি ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা, তাই ব্যক্তিগত দায়িত্বে বাড়ী নেওয়া হলো। সংসদের জরুরী সভা ডেকে প্রথম ম্যানেজারকে অব্যবস্থার অভিযোগে বরখাস্ত করা হোলো।

প্রথম বছর দুই সংসদ প্রায় আমাদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বাস ছিল মধ্যবিত্তের জন্য এ ব্যবস্থা বিফল হতে পারে না। আজ শুধু আমাদের সংসদ সদন শক্ত বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েছে তাই নয়, গত ১০/১৫ বছরে অন্ততঃ ১০টা গেস্টহাউস চালু হয়েছে রাজধানীতে যার পরিচালনার ভার বিভিন্ন বাঙালী সংস্থার হাতে।

তবু এই প্রচেষ্টাকে সংহত করার মতো কোন সংগঠন আজও নাই। ফলে একটি গেস্টহাউস থেকে যখন স্থানাভাবে লোক ফিরে যায়, আর একটিতে তখন ঘর খালি পড়ে থাকে।

অথবা ধরুন স্কুলের কথা। রাজধানীতে আটটি বাঙালী-পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অনেক অর্থ আর ঘাম খরচ করে এখানকার বাঙালী সমাজ এই বিদ্যালয়গুলো গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে তিনটির পরিচালনায় বাঙালীর উদ্যম ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। সবচেয়ে প্রথম সারীর একটি বালিকা বিদ্যালয় তার বহুদিনের গৌরব হারাতে বসেছে। কারা এর জন্য দায়ী? একটি পুরাতন স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ বাঙালী সংস্থায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কেউ তাকে প্রশ্ন করে না এ অধিকার তাঁকে কে দিল? বাঙালী সমাজ নির্বিকার। কেন সামাজিক চেতনা মুখর হয়ে ওঠে না? অনুভূতি নেই তা নয়। কিন্তু কে এই অনুভূতিকে ভাষা দেবে? কোথায় সেই সংগঠন?

এখন দিল্লীতে বাঙালীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ, হাজার হাজার পরিবার। গত এক দশকে যা'রা এসেছেন তাদের একটি বড় অংশ নিম্নবিত্ত পরিবারের। রাজধানীতে ছোট বড়ো প্রায় ৪০টি বাঙালী সংস্থা আছে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে তাদের সভ্য সদস্য সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশী নয়। একথা বললে কি অন্যায় হবে যে রাজধানীর বাঙালীদের বিরাট গরিষ্ঠ অংশ সংগঠিত সামাজিক চেতনার শরীক নয়? এই অবস্থায় কোন্ সংগঠনের সভ্য সংখ্যা বেশী সে কথা গৌণ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না। দিল্লীর বাঙালী সমাজে একটা অখণ্ড সামাজিক চেতনার অস্তিত্ব আজও চোখে পড়ে না। সবই বোধহয় খণ্ড খণ্ড আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। ইদানীং কালে গড়ে ওঠা বাঙালী কলোনী চিত্তরঞ্জন পার্ক এই আঞ্চলিক বোধের ভিত্তিমূল আরও পাকা করেছে। এই সীমাবদ্ধতা আমাদের কাটাতেই হবে।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

যে সব সংস্থা বড় বড় ভবন করেছেন তাদের অনেকেরই দৃষ্টির দিগন্ত সেই ভবনের দেওয়ালে আটকে গিয়েছে। ব্যক্তি এবং সংস্থা দুয়ের পক্ষেই এটি সত্য। সমাজ পরিবর্তনের শক্তি সেই সমাজের চৌহিদ্দির মধ্যেই আহরিত সম্পদের চারদেয়ালে বন্দী হয়ে কি করে স্থিতাবস্থার শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তার উদাহরণ বিরল নয়।

আমাদের বিশ্বাস যে করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের সুউচ্চ ভবন দৃষ্টির প্রসারতা আনবে এবং সংসদ আগামী দিনে রাজধানীর অন্যান্য সংস্থার সাথে হাত মিলিয়ে বাঙালী সমাজের একটি অখণ্ড চেতনা এবং তারই ধারক হিসাবে সংগঠন গড়ার কাজে তার নিজের গৌরবময় দায়িত্ব পালন করবে।

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দ্র সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।